Vol. 40 | No. 3 | 1997

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

পালি সাহিত্যে নারীর গার্হস্থ্যজীবন : একটি পর্যালোচনা

Volume	40
Issue	3
Year	1997
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	বেলু রানী বড়ুয়া
Published online	February 1, 1997
DOI	10.62328/sp.v40i3.9
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v40i3.9
Pages	183-192
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পালি সাহিত্যে নারীর গার্হস্থ্যজীবন ... া

Check for updates

বেলু রানী বড়ুয়া

প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধযুগে নারীচরিত্রে ধর্মীয় জীবনের প্রতি উৎসাহ ও বিমুক্তিমার্গ অনুসরণের প্রতি আগ্রহই বেশি প্রকট হয়েছে। ব্রাহ্মণ্যযুগের সতীলক্ষ্মী, ন্যায়-আদর্শ ভার্যারূপে নারীত্ব প্রকাশের প্রতিফলন পালি সাহিত্যে অপেক্ষাকৃত কম হলেও আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশের পূর্বে তাঁদের গার্হস্থ্য জীবনের প্রতিচ্ছবি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। বুদ্ধ ভিক্ষুণীসংঘ প্রতিষ্ঠা করে মহিলাদের ধর্মে প্রবেশের সুযোগ দিয়েছিলেন। ফলে সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়, গোত্র, স্তর, শ্রেণী হতে নারীরা সেখানে যোগদান করেন। এখানে সদ্বংশজাত পতিপরায়ণা ও উচ্চবংশজাত রাজ-পরিবার এবং ধনী ব্যক্তিদের স্ত্রী-কন্যাদের যেমন সমাবেশ ঘটেছে, তেমনি বিবাহিত, অবিবাহিত, বিধবা, ক্রীতদাসী, বারবণিতার সংখ্যাও কম নয়। বলতে গেলে, সমাজের সর্বস্তরের নারী বৌদ্ধ ভিক্ষুণী বা সন্ন্যাসিনীরূপে মুক্তিমার্গ অনুশীলনে পরবর্তী জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। তাঁদের গার্হস্থ্য জীবনের কথা নিজেরাই কবিতা বা উক্তির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের মহাপ্রয়াণে তাঁর বিধবা পত্নী মহাপ্রজাপতি গৌতমী অভিজাত বংশোদ্ভূত পাঁচশত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির স্ত্রীসহ ভিক্ষুণী হিসেবে পরবর্তী জীবন অতিবাহিত করার জন্য বুদ্ধের অনুমতি পেয়েছিলেন। কালক্রমে এর পরিব্যাপ্তি ঘটে।[১] তাঁরা বুদ্ধের উপদেশ শুনে সাধনমার্গে বিচরণ করে বিমুক্তি লাভ করেছিলেন। সাধনমার্গে তাঁদের উন্নতিতে তাঁরা হৃদয়ের যে উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করেছিলেন সেই প্রতিধ্বনিই ত্রিপিটকের থেরীগাথা, থেরী-অপদান, পরমত্থদীপনী প্রভৃতি গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে।

বুদ্ধের পূর্ববর্তীযুগে কন্যাসন্তানের জন্ম পরিবারে কাঙ্ক্ষিত ছিল না। তাদের পরিবারের বোঝা মনে করা হত। বরঞ্চ পুত্রসন্তানের জন্মকে স্বাগত জানানো হত। পিতামাতার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যেই পুত্রসন্তানের প্রতি স্নেহ, ভালবাসা বেশি বর্ষিত হত। বৌদ্ধযুগে পুত্রসন্তান ও কন্যাসন্তানের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। উভয়েই মা-বাবা ও সমাজে সমাদৃত হত। কন্যাসন্তানের জননী হওয়ায় ক্ষত্রিয়রাজা কোশরাজ প্রসেনজিত তাঁর স্ত্রী উব্বিরীকে রাজমহিষীর স্থানে উন্নীত করেন।[২] আবার সেই রাজনন্দিনী জীবার মৃত্যু হলে শোকার্ত অগ্রমহিষী উব্বিরী পাগলিনী হয়ে পথে পথে ঘুরেছেন। অচিরাবতী নদীর ধারে শ্মশানে গিয়ে দিন-রাত কেঁদেছেন।[৩] পিতৃগৃহে কোন মেয়ে অনাদর ও অবহেলা পেয়েছে এমন দৃষ্টান্ত পালি সাহিত্যে পাওয়া যায় না।

ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর প্রিয় কন্যা বিশাখা এদিক থেকে পালি সাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। কোশল রাজ্যের সাকেত নগরের ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর পঞ্চকল্যাণবতী[৪] কন্যা বিশাখার সাথে শ্রাবস্তীর ধনকুবের মৃগারের পুত্র পুণ্যবর্ধনের বিয়ে হয়। শ্বশুরালয়ে যাবার সময় ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী[৫] চুয়ান্ন কোটি স্বর্ণমুদ্রা, মহালতা প্রসাধন[৬], দাস-দাসী, গাভী, ধান-চাউল, কাপড়-চোপড়, আসবাবপত্র দিয়ে শত শত গাড়ি বোঝাই করে দিয়ে বরযাত্রীদের সামনে এগিয়ে দিয়েছিলেন।[৭] বিশাখার বিয়ের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে- নারীর সাংসারিক জীবনকে সুখময় করার জন্য তাঁর পিতা তাঁকে যে দশটি[৮] মূল্যবান উপদেশ দিয়েছিলেন সেগুলো শুধু প্রাচীনকালে নয়, বর্তমান যুগেও যে কোন নারীর অনুকরণীয়:

১. ঘরের আগুন বাইরে নিও না।
   শ্বশুর, শাশুড়ি, স্বামী এবং পরিজনবর্গের দোষকথা আগুন সদৃশ। তা বাইরে কারও কাছে এমনকি পিত্রালয়েও সেকথা বলবে না। তাতে শ্বশুরকুলের গৌরব, মর্যাদা নষ্ট হয়।
২. বাইরের আগুন ঘরে এনো না।
   প্রতিবেশীরা শ্বশুর, শাশুড়ি, স্বামী, পরিজনদের দোষ বললে সেকথা শুনে ঘরের কাউকে এমনকি দাসদাসীকেও বলবে না। কারণ এ আগুন পরিবারে অনর্থ সৃষ্টি করবে।
৩. যে দিয়ে থাকে তাকে দিও।
   যারা কোন দ্রব্য ধার নিয়ে পুনরায় ফেরত দেয় তাদের ধার দেবে।
৪. যে দেয় না তাকে দিও না।
   যারা ধার পরিশোধ করে না তাদের ধার দেবে না।
৫. যে দিয়ে থাকে তাকে দিও, যে দেয় না তাকেও দিও।
   যদি কোন দরিদ্র জ্ঞাতি কিছু চায়, সে ফেরত দিতে পারুক বা না পারুক তাকেও দিতে হবে।
৬. সুখে বসবে।
   শ্বশুর, শাশুড়ি, স্বামী প্রভৃতি গুরুজনদের দেখে উঠতে হয় এমন আসনে বা স্থানে বসতে নেই।
৭. সুখে আহার করবে।
   শ্বশুর, শাশুড়ি, স্বামী প্রভৃতি গুরুজন অভুক্ত আছে কি না তত্ত্ব নিয়ে স্বয়ং আহার করবে।
৮. সুখে শয়ন করবে।
   শ্বশুর, শাশুড়ি, স্বামী প্রভৃতি গুরুজনদের প্রয়োজনীয় কার্য সমাধান করে নিশ্চিন্ত মনে শয়ন করবে।

৯. অগ্নির পরিচর্যা করবে।
অগ্নিতুল্য শ্বশুর, শাশুড়ি, স্বামীর পরিচর্যা করবে।

১০. গৃহদেবতাকে ভক্তি করবে।
পরিবারের গুরুজনকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করবে।
এছাড়া নারীজাতি নিম্নোক্ত চারটি কারণে[৯] ইহলোক (সংসার) বিজয়ে সহায়ক হয় ঃ

১. যদি সে পারিবারিক কর্মে (স্বামীগৃহে) সুদক্ষা, অনলসা হয়, উচিত-অনুচিত কর্মে বিচার-নিপুণা হয়।

২. যদি সে দাস-দাসী, কর্মচারীদের কর্ম পরিদর্শন করে; তাদের কর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছে কি না খোঁজ খবর নেয়; তাদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করে; তাদের শক্তি ও সার্মথ্যানুযায়ী কাজকর্ম বন্টন করে; অসুস্থ হলে ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করে; খাদ্যভোজ্য প্রত্যেকের প্রাপ্য অনুসারে বিতরণ করে।

৩. যদি সে স্বামীর উপার্জিত ধন, ধান্য, স্বর্ণ, রৌপ্যাদি সম্পদ রক্ষা করে; ধূর্তা, চোর না হয়; যদি সে বিনাশিনী না হয়।

৪. যদি সে স্বামীর অমনোজ্ঞ কাজ না করে।

এ চার গুণে বিভূষিতা হলে, নারীরা কুলধর্মে অর্থাৎ গার্হস্থ্যজীবনে বিজয়িনী হয়। বিশাখার এ গুণগুলোও বর্তমান ছিল। মাতৃজাতির মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। কোলীয় কন্যা সুপ্রবাসা, সেনানীকন্যা সুজাতা, রানী মল্লিকাদেবী প্রভৃতি কুলনারীদের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বৌদ্ধযুগে সেই লোকপ্রবাদ 'লক্ষ্মী বৌ' এর অভাব ছিল না।

বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী ও দাস-দাসী পরিবৃত হয়েও স্বর্ণকার কন্যা শুভা[১০] অবিবাহিত জীবনে পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগ্নিদের দেখাশুনা করতেন। তিনি স্বয়ং বিশাল ভূ-সম্পত্তি, শস্যক্ষেত্র, গৃহস্থালি পরিচালনা করতেন। গৃহকর্মে সুচতুরা শুভা তাঁর আত্মীয়-স্বজনদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ইসিদাসীর তিনবার বিয়ের কথা[১১] তৎকালীন সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেয়। উজ্জয়িনীর ধনকুবেরের একমাত্র কন্যা ইসিদাসী। সাকেত নগরীর উচ্চকুলসম্পন্ন বণিকের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। তিনি শ্বশুর, শাশুড়ি, ভ্রাতা, ভগ্নি, স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। সর্বগুণে গুণান্বিত হওয়া সত্ত্বেও অনাদর ও অবহেলায় স্বামীর ঘর করতে পারেননি। তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন:

অঞ্জন লেপন নিয়ে, চিরুণী আরসি দিয়ে,
পরিচারিকার মত নিজ হাতে আমি

দিতাম সাজায়ে তারে; সাজিতেন স্বামী।
এক পুত্র মাতা সম আদরে পতিকে মম
সাধিতাম; রাঁধিতাম নিজ হাতে ভাত;
ধুতাম বাসনগুলি, ফেলিতাম পাত।
কথায় কাহিনী কথা, দাসী সম কাজে রতা;
অশ্রান্ত প্রভাত হতে খাটিতাম আমি,
তবুও আমাকে ভালবাসিল না স্বামী।[১২]

সাধারণত কন্যার পিতামাতা বা অভিভাবকরাই তাঁদের মনোমত পাত্রের সাথে কন্যার বিয়ে ঠিক করতেন। এ ক্ষেত্রে কন্যার ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করা হত না। কন্যা যাতে সুখে সংসার করতে পারে তার উপরই অভিভাবকরা বেশি যত্নবান হতেন। কুল বা পরিবারের সম্মান ও পদমর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সবাই সচেষ্ট থাকতেন। এসত্ত্বেও অবাঞ্ছিত ঘটনা যে ঘটত না তা নয়। পটাচারার[১৩] প্রেমময় কাহিনী পিতামাতার সকল সতর্কতাকে পর্যুদস্ত করে দিয়েছিল। শ্রাবস্তীর শ্রেষ্ঠীকন্যা পটাচারা গৃহভৃত্যের প্রেমে পড়েন। তাঁর পিতামাতা আঁচ করতে পেরে তাঁকে সপ্ততল বিশিষ্ট প্রাসাদের সর্বোচ্চ তলায় রেখে প্রহরার ব্যবস্থা করেন। ইতোমধ্যে সমপদস্থ এক যুবকের সাথে তাঁর বিয়ের দিনও ঠিক করা হয়। কিন্তু পটাচারা প্রণয়ীর সাথে গোপনে পালিয়ে বনের সীমান্ত ধারে এক ক্ষুদ্র পল্লীতে বসবাস শুরু করেন। কর্মবিপাকে স্বামী সর্পদষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করে। পিতৃগৃহে যাবার পথে পাহাড়িয়া স্রোতস্বিনীতে দুই ছেলে ডুবে মরে। পিতামাতা, ভাইভগ্নি ঘূর্ণিঝড়ে গৃহ চাপা পড়ে মারা যায়। ভারসাম্য হারিয়ে পটাচারার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। উন্মাদিনী পটাচারা আপন বিয়োগদুঃখের কথা আক্ষেপ করে বলেছেন:

পতি-পুত্র তিনজন দু:খিনীর প্রাণধন
করে গেলে মোরে অনাথিনী,
ওরে মম বাছাধন দেখা দিয়ে কিছুক্ষণ
কোথা গেলি নয়নের মণি।

....

বড় আশা ছিল মনে নিয়ে অতি পুত্রধনে
সংসার পাতিব মন-সুখে,
হায় হায়! এ কি হল ভরা নৌকা ডুবে গেল
শোকানল জ্বলে মম বুকে।[১৪]

বৌদ্ধযুগে বালিকাদের বিয়ের বয়:ক্রম নির্দিষ্ট না থাকলেও সাধারণত ষোল থেকে বিশ বছরের মধ্যেই তাদের বিয়ের কার্য সম্পন্ন করা হত। ভদ্র কুণ্ডলকেশী

ইসিদাসী, পটাচারা, মল্লিকাদেবী প্রভৃতি মহিলাদের ষোল বছর বয়সে বিয়ে হয়।[১৫] এতে মনে হয়, তখনকার দিনে ষোল বছর বয়সকে মেয়ের 'সাবালিকা' গণ্য করা হত। সেলা,[১৬] সুমেধা[১৭] প্রভৃতি মহিলাদের নারীজীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা পিতৃগৃহে কুমারী কন্যা রূপে অবস্থান করেছিলেন। সুতরাং এতে বোঝা যায়, বৌদ্ধযুগে মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে বাল্যবিবাহ নয়, সাবালিকার বয়সই স্থির করা হত। প্রাচীন ভারতে আট প্রকার বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। যথা- ব্রাহ্ম, গান্ধর্ব, দৈব, প্রাজাপত্য, আর্য, পৈশাচ, রাক্ষস ও অসুর[১৮]। কিন্তু বৌদ্ধযুগে তিন ধরনের বিয়ের প্রবর্তন হয়েছিল। ১. কন্যা ও পাত্র-উভয়পক্ষের অভিভাবক কর্তৃক স্থিরীকৃত বিবাহ; ২. স্বয়ম্বর বিবাহ এবং ৩. গান্ধর্ব বিবাহ।[১৯] তবে প্রথম ধরনের বিয়ের উল্লেখই পালি সাহিত্যে বেশি। প্রথম ধরনের বিয়ে সাধারণত দুই পক্ষের অভিভাবকরাই ঠিক করেন। সমবর্ণ ও সমমর্যাদা সম্পন্ন দুই পরিবারের ভিতরই এ বিয়ে অনুষ্ঠিত হত। এ বিয়েতে সচরাচর বরযাত্রী মেয়ের বাড়িতেই যেতেন। কন্যাপক্ষ বরপক্ষের বাসস্থান, আনুষঙ্গিক বস্তু ও খাদ্যভোজের ব্যবস্থা করতেন। দ্বিতীয় ধরনের বিয়ে-স্বয়ম্বর প্রথায় সমবেত পাণিপ্রার্থীদের মধ্য থেকে কন্যা তার পছন্দ মত যেকোন একজনকে বেছে নিয়ে স্বামীরূপে গ্রহণ করত। তৃতীয় ধরনের বিয়ে গান্ধর্ব বিবাহ নামে পরিচিত। এ ধরনের বিয়েতে মা-বাবা কিংবা অভিভাবককের মতামত ছাড়াই অজ্ঞাতসারে পাত্র ও পাত্রী পরস্পরকে ভালবেসে স্বামী-স্ত্রীরূপে সংসার যাত্রা আরম্ভ করত। এই শ্রেণীর বিয়েতে সামাজিক রীতিনীতি অনুসারে কোন অনুষ্ঠান হত না।[২০]

তখনকার দিনেও যৌতুক প্রদান করা হত। কোশল রাজ্যের অধিপতি মহাকোশল (মহাপ্রসেনজিত)-এর কন্যা বৈদেহী বিয়ের সময় মগধরাজ বিম্বিসারকে কাশীগ্রাম যৌতুক দেওয়া হয়েছিল। প্রসেনজিত ভগ্নিপতির উপর ক্রুদ্ধ হয়ে পিতৃপ্রদত্ত কাশীগ্রাম পিতৃঘাতী অজাতশত্রুর কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু অজাতশত্রুর সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে উভয়ে সন্ধি করেন। পরে নিজের ঔরসজাত কন্যা-রাজনন্দিনী বজ্রকুমারীকে বিয়ে দিয়ে কাশীগ্রাম প্রত্যর্পণ করেন[২১]। বৈদিক যুগের মত বৌদ্ধযুগেও একবিবাহ প্রথা প্রধানত প্রচলিত ছিল। কিন্তু বহুবিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না। বিশেষ করে রাজা, শ্রেষ্ঠী, অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু বিবাহ দেখা যায়। উব্বিরী, সোনা, সকুলা প্রভৃতি নারীরা রাজা প্রসেনজিতের মহিষী ছিলেন। অনুরূপভাবে ক্ষেমা, বৈদেহী প্রভৃতি মহিষীরাও মগধরাজ বিম্বিসারের স্ত্রী ছিলেন। বৌদ্ধযুগে বিবাহ-বিচ্ছেদ রীতি বর্তমান ছিল কিন্তু তা আইনানুগ ছিল কি না তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। নারীদের বিবাহিত জীবনে কুলবধূ হিসাবে স্বামী ও শ্বশুর গৃহের বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি কর্তব্য ও সেবার উদাহরণ পালি সাহিত্যের

অনেক স্থানে পাওয়া যায়। ইসিদাসীর সেবাপরায়ণতা ও গৃহধর্ম নিম্নোক্ত কবিতাংশে অতি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

সায়াহ্নে প্রভাতে নিত্য ভক্তিপূর্ণ করি চিত্ত
শ্বশুর শাশুড়ি দোঁহে করিয়া প্রণাম;
গৃহধর্মে নিয়োজিতা সদা রহিতাম।
আপন আসন দিয়া বসাতাম সম্ভাষিয়া
পতির ভগিনী, ভ্রাতা, অন্য পরিজনে,
নিকটে দেখিবামাত্র আগ্রহে যতনে।
গৃহে অন্নপানে যাহা রহিত, দিতাম তাহা
যাহাকে যেমনভাবে দিবার বিধান;
পাইতেন সবে তাহা, যিনি যাহা চান।[২২]

'সর্বক্ষেত্রে পুরুষ নারীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়; নারীও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ও সুচতুর হলে পুরুষের সমকক্ষ হতে পারে।'[২৩]-এ কথাটি স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে ভদ্রা কুণ্ডলকেশীর জীবনে। রাজগৃহের রাজ-কোষাধ্যক্ষের ঘরে তাঁর জন্ম হয়। সৌন্দর্য ও পূর্ণ যৌবনের এক উজ্জ্বল প্রতীক। একদিন নগররক্ষীরা এক সুন্দর ব্রাহ্মণযুবক সত্থু নামক চোরকে বধ্যভূমিতে বধ করার জন্য রাজার আদেশে নিয়ে যাচ্ছিল। প্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়িয়ে ভদ্রা তাকে দেখে প্রথম দর্শনেই তার প্রতি অনুরক্তা হন। কন্যার প্রতি গভীর স্নেহবশত পিতা রক্ষীকে প্রচুর উৎকোচ দিয়ে অপরাধীকে মুক্ত করে বিয়ে দেন। কিন্তু চৌর্যবৃত্তি যার স্বভাব সেই চোরস্বামী ভদ্রার মূল্যবান রত্নসমূহ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাঁকে মেরে ফেলার জন্য নিয়ে যায় শৈলশৃঙ্গে। স্বামীর দুষ্টবুদ্ধি বুঝতে পেরে ভদ্রা শেষ আলিঙ্গন ও শ্রদ্ধা করার ছলনায় চোরস্বামীকে শৃঙ্গ থেকে ফেলে দেন। পর্বতের তলদেশের গভীর গর্তে পড়ে সত্থু প্রাণ হারায়।

বিবাহিত জীবনে নারীরা কখনও কখনও স্বামীদের দ্বারা অবহেলিত ও উৎপীড়িত হতেন। শুধু তাই নয়, দু:খকর পরিস্থিতি যেটা, সেটা হচ্ছে সপত্নীর সাথে ঘর করা। কৃশা গৌতমী এ দু:সহ যাতনার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে প্রসব বেদনার কথা পর্যন্ত তুলে ধরেছেন:

স্ত্রীজীবন দু:খময়, বলেছেন মানব সারথী;
সপত্নীর সহবাস প্রসবাদি, দু:খময় অতি।
মরে সুকুমারী নারী উদ্বন্ধনে, কিংবা বিষ খায়;
প্রাণনাশকারী ভ্রূণ মাতা সহ মরে এ ধরায়।[২৪]

সচরাচর দেখা যায়, বিবাহিতা নারী তার স্বামী, সংসার, সন্তান নিয়েই জীবন অতিবাহিত করতেন। সাংসারিক জীবনের সকল গৃহকর্ম তাদের দৈনন্দিন ব্রত হিসেবে পরিগণিত হত। কিন্তু দরিদ্র ও নিম্ন শ্রেণীর নারীদের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ছিল। দারিদ্র্যের কারণেই ভরণপোষণের জন্য গৃহকার্য ছাড়াও তাদের অন্য কোন বৃত্তি অবলম্বন করতে হত। তারা স্বামীর ইচ্ছা ব্যতিত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে পারত না। বৌদ্ধযুগে পুরুষদের মত নারীরাও সম্পত্তির অধিকারিণী হতে পারতেন। সুন্দরীর পিতা ভিক্ষুজীবন গ্রহণ করলে পূর্বে সমস্ত সম্পত্তি কন্যার হিতার্থে স্ত্রীকে সমর্পণ করেন। পরে সুন্দরী সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হন।

হস্তী, গো ও অশ্বগণ   মণিকুণ্ডলাদি ধন,
এ সমৃদ্ধ গৃহ ত্যজি জনক তোমার,
প্রব্রজ্যা করিল আজি   হে সুন্দরী! ধনরাজি
কর ভোগ একাকিনী দায়দে তাহার।[২৫]

নারীর বৈধব্যজীবন সম্পর্কে পালি সাহিত্যে সবিশেষ উল্লেখ না থাকলেও সহমরণ কিংবা অগ্নিদগ্ধ করার প্রথা প্রচলিত ছিল না। এমন কি স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর সামাজিক মর্যাদাও ক্ষুণ্ন হত না। মহাপ্রজাপতি গৌতমী, সুন্দরী পদ্মাবতী (অভয়-মাতা) তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পুত্র সন্তানের জননী হয়েও ক্ষেত্রবিশেষে সন্তানের কাছে অবজ্ঞার পাত্রী হয়েছেন এমনও প্রমাণ পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নারীর স্বনির্ভরতা সমাজে বর্তমান ছিল। নারী সর্বদা কেবলমাত্র চার প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ থাকত না। কর্মরতা মহিলাদের মধ্যে শিক্ষিকা, তন্তুবায়, নর্তকী, পরিচারিকা, গণিকা প্রভৃতি অনেক রকমের পেশা ছিল। মহাপ্রজাপতি **গৌতমী, কুণ্ডলকেশী, নন্দুত্তরা, পূর্ণিকা প্রভৃতি নারীরা গার্হস্থ্যজীবনে যেমন শিক্ষিতা ও জ্ঞানী ছিলেন, তেমনি ভিক্ষুণীজীবনেও প্রজ্ঞার অধিকারী হয়েছিলেন।** পতিতাবৃত্তি পেশা হলেও আম্রপালীর[২৬] স্থাবর ও অস্থাবর যে সম্পদ ছিল তা ধনীদেরও লোভের কারণ হয়েছিল। তার বিলাসী 'আম্রকানন' রাজা, শ্রেষ্ঠীদের শুধু প্রমোদবিহারের স্থান ছিল না; এর নৈসর্গিক সৌন্দর্য ও বিস্তৃতি দেখে তাঁদের অধিগ্রহণেরও প্রবৃত্তি ছিল। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও অনেক নারী বিস্ময়কর কৃতিত্ব অর্জন করেছিল। নারীজাতির সুশিক্ষা, স্বাধীনতা ও গৌরবের কাহিনী থেরীগাথা, থেরী-অপদান, পরমত্থদীপনী প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত আছে। নারীর মুক্তি কামনায় এ গ্রন্থগুলো যেমন নিবেদিত; অপরপক্ষে ভিক্ষুণীদের ব্যক্তিগত জীবনের সাংসারিক সুখ-দু:খ ও সমাজ জীবনের বর্ণনাও প্রাধান্য লাভ করেছে। এ গ্রন্থগুলো প্রমাণ করে যে, ভারতীয় সমাজে নারী শিক্ষা ও নারী স্বাধীনতা বৌদ্ধযুগেই প্রসারিত হয়। বৌদ্ধ মহীয়সী নারীদের জীবনীগ্রন্থ থেরীগাথা সম্পর্কে প্রফেসর রীচ ডেবিডস্ যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য :

গৌতম বুদ্ধের সময় থেরীগণ গঙ্গানদীর উপত্যকায় যেরূপ জীবন যাপন করতেন, থেরীগাথা হতে তার একটি অতি উপদেশপ্রদ চিত্র পাওয়া যায়। নারীদের এত স্বাধীনতা প্রদান এবং তাদের এত উচ্চস্থান দেওয়া বৌদ্ধ সংস্কারের নেতাদের পক্ষে সাহসের কাজ হয়েছিল।[২৭]

পালি সাহিত্যে বিধৃত নারী চরিত্রে সমাজ পরিত্যক্তা, নিগৃহীতা, পতিতা নারীদের কথা বেশি পরিস্ফুট হলেও তাঁদের সুখ-দু:খের অনুভূতির অভিব্যক্তিতে প্রাচীন ভারতের নারীর গার্হস্থ্যজীবন সম্পর্কে একটি নিখুঁত চিত্র ফুটে উঠেছে। পূর্ববর্তী যুগে ভারতীয় সমাজে নারীদের প্রতি যে অবজ্ঞা ও অসমতা বিদ্যমান ছিল, বৌদ্ধযুগে তা অনেকটা দূরীভূত হয়। বুদ্ধ তৎকালীন সমাজ মনের প্রতিধ্বনির নিরিখেই তাদের উদ্ধার করে সকল নির্যাতিত নারীকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি নারী-পুরুষের সমতা বিধানে একটি আদর্শ নারীসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

তথ্য নির্দেশ

১. Vinaya Pitaka, vol. 2, Cullavagga, ed. H. Oldenberg (P.T.S, London, Reprint, Motilal Banarsidas, Delhi, (1965), PP. 253-256.

২. ভিক্ষু শীলভদ্র প্রণীত থেরীগাথা (মহাবোধি সোসাইটি, কলিকাতা, ১৩৫৭ বাংলা), পৃ: ৩৩-৩৫

৩. ঐ, পৃ: ৩৩

৪. রূপাশ্রীমন্ডিত নারীর পাঁচটি গুণকে 'পঞ্চ কল্যাণবতী' বলা হয়। যথা-

ক. কেশকল্যাণ-যে নারীর কেশদাম ময়ুরপুচ্ছ সদৃশ, ভ্রমরকৃষ্ণ এবং তা পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত নেমে অগ্রভাগ উর্ধ্বমুখী বিরাজ করে তাকে বলা হয় কেশকল্যাণবতী।

খ. মাংসকল্যাণ-যে নারীর দন্তাবরণ অধরোষ্ঠ পক্ক বিম্বফল বর্ণের ন্যায় সুখস্পর্শ হয়ে থাকে তাকে বলা হয় মাংসকল্যাণবতী।

গ. অস্থিকল্যাণ-যে নারীর দন্তরাজী শ্বেত, সমান, ঘন, ছিদ্রহীন, সুদক্ষ শিল্পীর ন্যায় সুকৌশলে রচিত বৈদুর্য পংক্তির মত শোভা পায় তাকে বলা হয় অস্থিকল্যাণবতী।

ঘ. ছবিকল্যাণ-যে নারীর দেহচর্ম স্নিগ্ধ, মসৃণ, রূপশ্রীমণ্ডিত, দর্শনীয়, কর্ণিকার পুষ্পের ন্যায় শ্বেতবর্ণ তাকে বলা হয় ছবিকল্যাণবতী।

ঙ. বয়সকল্যাণ-যে নারী দশ, বিশ সন্তানের জননী হলেও ষোড়শী যুবতীর ন্যায় যৌবনা থাকে তাকে বলা হয় বয়সকল্যাণবতী।

(বাংলা অনুবাদ)
[মূল: ধম্মপদ-অট্ঠকথা: বিসাখায় বত্থু]

৫. পালি 'সেট্ঠী' বা সংস্কৃত 'শ্রেষ্ঠী' শব্দের অর্থ ধনকুবের। শ্রেষ্ঠীরা ক্ষেত্রবিশেষে সামন্ত রাজার পদমর্যাদা লাভ করতেন। রাজ-রাজড়াও প্রয়োজনে তাদের কাছ থেকে নগদ অর্থ ধার নিতেন। বর্তমানে প্রচলিত 'শেঠ' শব্দটিও একই অর্থে প্রযোজ্য। বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসারে শ্রেষ্ঠীদের অবদান ছিল বেশী।

৬. মহালতা প্রসাধন-এ অলঙ্কার প্রস্তুতের উপকরণ হল: স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরা, মুক্তা, বৈদুর্যমণি, প্রবাল ইত্যাদি। এ অলঙ্কারে ফল-পুষ্প, পত্র-পল্লব, লতা বিভূষিত থাকে। বিচিত্র চারুশিল্প অলঙ্কৃত মস্তকোপরি ময়ুর শোভিত থাকে যা নারীর আপাদমস্তক পরিশোভিত করে। বিশাখার জন্য এ মহালতা প্রসাধন তৈরি করতে নয় কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় হয়েছিল। তার নির্মাণ পারিশ্রমিক এক লক্ষ মুদ্রা। এতে স্বর্ণকারদের চার মাস সময় লেগেছিল।

৭. তস্সা দেয়্যধম্মং দদমানো কহাপণপূরানি পঞ্চ সকটসতানি অদাসি, সুবণ্ণভাজনপূরানি পঞ্চ সকটসতানি, রজতভাজনপূরানি পঞ্চ, তম্বভাজনপূরানি পঞ্চ, পট্টবত্থ-কোসেয্যবত্থপূরানি পঞ্চ সকটসতানি, সপ্পিপূরানি পঞ্চ, সালিতণ্ডুলপূরানি পঞ্চ, নঙ্গলফালাদি-উপকরণপূরানি পঞ্চ সকটসতানি।

[ধর্ম্ম পদট্ঠকথা-বিসাখার বত্থু]

৮. সসুরকুলে বসন্তিয়া নাম অন্তো-অগ্গি বহি ন নীহরিতব্বো, বহি-অগ্গি অন্তো ন পবেসেতব্বো, দদন্তস্সেব দাতব্বং, অদদন্তস্স ন দাতব্বং, দদন্তস্সসাপি অদন্তস্সাপি দাতব্বং, সুখং নিসীতব্বং, সুখং ভুঞ্জিতব্বং, সুখং নিপজ্জিতব্বং, অগ্গি পরিচরিতব্বো, অন্তোদেবতাপি নমস্সিতব্বা'তি। [ধম্মপদট্ঠকথা-বিসাখায় বত্থু]

৯. সুভূতি রঞ্জন বড়ুয়া, বৌদ্ধ মহীয়সী নারী (ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৪০০ বাংলা), পৃ: ৭৪

১০. ঐ পৃ: ১৭২-১৭৪

১১. সংঘরাজ শীলালঙ্কার মহাস্থবির, বুদ্ধযুগে বৌদ্ধ নারী (ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৩৯৭ বাংলা), পৃ: ১৩১-১৪১

১২. বিজয়চন্দ্র মজুমদার, থেরীগাথা (সাধনা লাইব্রেরী, ঢাকা, সন-তারিখ নেই), পৃ: ১৩৯-১৪০

১৩. Paramatthadipani, vol. vi (Therigatha Atthakatha) edited by E. Muller (Pali Text Society, London, 1893, Reprinted. Motilal Banarsidass, Delhi, 1965), PP. 108-117

১৪. সংঘরাজ শীলালঙ্কার মহাস্থবির, প্রাগুক্ত, পৃ: ৯২-৯৩
১৫. I.B. Horner, Women Under Primitive Buddhism (Routledge & Kegan Paul Ltd.; London 1930, Reprint, Motilal Banarsidass, Delhi, 1975), PP. 28-29.
১৬. Ibid.
১৭. Ibid.
১৮. A.S. Altekar, The Position of Women in Hindu civilization (The Cultural Publicaition House, Benares Hindu University, 1938), P. 54.
১৯. B.C. Law, 'Marriage in Buddhist Literature' (The Indian Historical Quaterly, Vol. II; No. 3, September, Calcutta, 1926), P. 565.
২০. বিমলাচরণ লাহা, বৌদ্ধ রমণী (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, কলিকাতা, ১৯২৯), পৃ: ৮-১২
২১. সংঘরাজ শীলালঙ্কার মহাস্থবির, অজাতশত্রু (ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৯৫ বাংলা), পৃ: ৯১-৯৭
২২. বিজয়চন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩৯
২৩. ন সো সব্বেসু ঠানেসু পুরিসো হোতি পণ্ডিতো।
ইত্থি পি পন্ডিতা হোতি মুহুত্তংপি চিন্তয়ে॥
(বিজয়চন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৭)
২৪. বিজয়চন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ: ৮০
২৫. হত্থিগবস্‌সং মণিকুণ্ডলঞ্চ ফীতঞ্চিমং গেহরিহত পহায়।
পিতা পব্বজিতো তুহ্যং ভুঞ্জ ভোগানি সুন্দরি।
[তুবং দায়াদিকা কুলে।]
থেরীগাথা, গাথা নং ৩২৭
২৬. রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, পালি সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৫০-৩৫৮
২৭. It affords a very instructive picture of the life they (Theris) led in the valley of the Ganges in the time of Gautama the Buddha. It was a bold step on the part of the leaders of the Buddhist reformation to allow so much freedom and to concede so high a position to women.
(T.W. Rhys Davids, Buddhism, London, 1910, Page. 72)